প্রবেশক

কবিতা : আধুনিকতা : আধুনিক বাংলা কবিতা

কাগজ কলম নিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকা প্রয়োজন আজ;
প্রতিটি ব্যর্থতা; ক্লান্তি কী অস্পষ্ট আত্মচিন্তা সঙ্গে নিয়ে আসে।
সতত বিশ্বাস হয়, প্রায় সব আয়োজনই হয়ে গেছে, তবু
কেবল নির্ভুলভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না এখনো।

— *আমার ঈশ্বরীকে : ৬* / বিনয় মজুমদার

'আধুনিকতার সংজ্ঞা' শীর্ষক তাঁর বহু আলোচিত প্রবন্ধের একেবারে প্রারম্ভ পঙ্‌ক্তিতেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বলেছিলেন, "প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার প্রস্থানভূমির পার্থক্য যদি এককথায় বলতে হয়, এটুকু বললেই পর্যাপ্ত হবে, প্রাচীন কাব্যের মূলসূত্র রচয়িতার আত্মবিলুপ্তি এবং পরবর্তী কবিতার উপপাদ্য *অভিমানী অহং*।" 'অভিমানী অহং' শব্দবন্ধটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এবং ব্যাখ্যা-উন্মুখ; কেননা, এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় লাইনেই অলোকরঞ্জন তাঁর ভাবনাবৃত্তটিকে সামান্য বর্ধিত করে দিয়ে মন্তব্য করলেন "...এই প্রভেদ সত্ত্বেও বাংলা কবিতায় আধুনিকতার চরিত্র ও মাত্রা সংক্রান্ত আলোচনায় মধুসূদন-পূর্ব অধ্যায়ের প্রবেশাধিকার অস্বাভাবিক নয়।" মধুসূদন-পরবর্তী এবং রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী নব্য রোম্যান্টিক কাব্যধারার কবিরাও একরকমভাবে আধুনিকতার সূচনাবিন্দুকে ত্বরান্বিত করেছিলেন— এ একরকম স্বীকৃত সত্য। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর বহু আলোচিত প্রবন্ধ 'New Essays in Criticism'-এ মন্তব্য করেছিলেন, "What is curious to note is that, in Bengal (as was the case in France in the last century), the illumination had led to a mechanical subjectivity, and that has been the environment out of which the neo-romantic movement has taken its rise. For the genesis of the movement it is essential that there should be a transition from a mechanical to an egoistical subjectivity, and this transition has actually taken place in the imaginative and intellectual culture of Bengal." বাকি জীবনের প্রারম্ভে মধুসূদনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠার আত্মবিশ্বাস অর্জনের লড়াই, কল্লোলীয় কবিদের রবীন্দ্রবিদ্রোহও অনেকটা সমমাত্রিক। অথচ, এ কথা ভুললে চলবে না, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি জীবনের শেষ দশকে কার্যত নিজেই নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 'সুন্দর' ও 'মঙ্গল'-এর ভারসাম্যে ম্যাথু আর্নল্ড কথিত যে 'sanity' ছিল তাঁর কাব্যলক্ষণ; রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় সেই ভারসাম্যকে টপকে গেছেন বহুবার। 'আধুনিক কাব্য' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক' শব্দটির মধ্যে দিয়ে শাশ্বতের ইশারা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। ইতিহাস কালের হিসেবে যে সময়কে 'আধুনিক'

Scanned with CamScanner

আখ্যা দিতে চেয়েছে; সে যুগের কাব্যমাত্রেই যে 'আধুনিক' হবে বিষয়টি এমনও নয়। 'আধুনিক কবিতা'-র 'আধুনিকতা' বিষয়টি যে কালনির্ভর নয়, বরং অনেকটাই ভাবনির্ভর— "এ কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা।" (আধুনিক কাব্য, 'সাহিত্যের পথে' *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড; বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪০২, পৃ. ৪৬৩) বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি বলছেন— "...নদী সামনের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন্। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকতাটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।" এই 'মর্জি' শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং নানা কারণে ব্যাখ্যারও দাবি রাখে। সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব 'কাল' এবং 'মর্জি' তথা ভাবের বিষয়টিকে নিজের মতো করে সীমায়িত করে আধুনিক বাংলা কবিতার সংজ্ঞা দান করার চেষ্টা করেছেন, "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।" [ভূমিকা, *আধুনিক বাংলা কবিতা* (সম্পাদক আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৮] সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী আবার আইয়ুবের এই সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতার বিষয়গুলির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, "মন্তব্যটি অতৃপ্তিজনকভাবে খণ্ডিত। এতে আধুনিকতার কোনো লক্ষণই নির্দেশিত নেই। রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত বাংলা কবিতা ত্রিশের দশকে তো নয়ই, হয়তো কোনোদিনই বাংলা কবিতায় পাওয়া যাবে না। তবু তা কিছুটা মুক্ত হয়েছে একেবারে ষাটের দশকের শেষে।" (পূর্বসূত্র, *আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৫) মোটামুটিভাবে বিশ শতকের তিরিশের দশককেই যদি আধুনিক কবিতার ভিত্তিভূমি হিসেবে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে তার চরিত্র নির্ণায়ক হিসেবে কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, "একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্রবৃত্তি।" [ভূমিকা, *আধুনিক বাংলা কবিতা*, (সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু), এম. সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ (পঞ্চম সংস্করণ), পৃ.৮] একই লেখায়, সংকলনের এই 'ভূমিকা'তেই তিনি জানিয়েছিলেন— "এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকলভাবে সনাক্ত করা যায়। ...আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলি ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে। শুধু ভিন্ন ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়। উপরন্তু এর একটি বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে প্রেমের কবিতা; সেই প্রেমের আরক্ত সংরাগ যেমন বাংলা কবিতার সাহসের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি প্রকৃতিও অন্যরকম অর্থ পেয়েছে; কখনো-বা রূপকথায় রূপান্তরিত হয়ে, কখনো-বা নাগরিক অথবা বৈদেশিক জীবনের পটভূমিকায়।

রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরীই আধুনিকতার ধারণাকে পাঠকের মনে গেঁথে দেওয়ার সচেতন প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন; কিন্তু প্রাকরণিক যুক্তিবাদ তাঁকে বহুলাংশেই পাঠকের কাছে পৌঁছতে বাধা দেয়— 'আধুনিকতা'-র সংজ্ঞাও যে বহুকৌণিক ও নিয়ত পরিবর্তনশীল;

সম্ভবত এ বিষয়টি সম্পর্কেও প্রমথ চৌধুরীর ভাব ও ভাবনা বহুলাংশে অস্পষ্ট ছিল। আর অন্যান্যদের ক্ষেত্রে, অলোকরঞ্জনের কথাতেই বলা যায়, "...কবি-ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ সমসাময়িকতার আকর্ষণী শক্তিতে উৎকেন্দ্রিক হতে থাকলেন এবং যতীন্দ্রনাথ কিংবা মোহিতলাল মনে করে বসলেন সত্যমাত্রেই অপ্রিয়।" ফলত, খুব স্বাভাবিকভাবেই এই তিনজনের আধুনিকতা বিষয়ক ব্যাখ্যা আংশিকতা দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর *কল্লোল যুগ*-এ আধুনিকতার এমনই এক খণ্ডসংজ্ঞা নির্মাণেই প্রয়াসী হয়েছেন :

> ...মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। এককথায়, তিনিই ছিলেন আধুনিকোত্তম। মনে হয়, যজন-যাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কাররহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়।

স্থূল হিসেবে মাইকেলকেই যদি বাংলা আধুনিক কবিতার সূচনাবিন্দু হিসেবে ধরে নিই, তাহলে একটা সংগত প্রশ্ন থেকেই যায়— মাইকেলই যদি আধুনিকতার সূচনাবিন্দু হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা কবিতা কী ছিল? 'অনাধুনিক' না কি 'প্রাগাধুনিক'? এই প্রশ্নের উত্তরে যেটা উঠে আসে তাহল 'আধুনিকতা' এমনই একটি লক্ষণ, যার নিজস্ব বৃত্তায়ন রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রাবন্ধিক অশ্রুকুমার সিকদারের *আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়* গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ হল 'আধুনিক কবিতার আধুনিকতা'। প্রবন্ধটিতে আধুনিকতার চরিত্র নির্ণয় প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুকে উদ্ধৃত করেই প্রবন্ধকার বলেছেন, "...সাল তারিখ দিয়ে আধুনিক কবিতার যাচাই চলে না; অধুনা রচিত অনাধুনিক কবিতার সংখ্যাও প্রচুর।" অর্থাৎ, তাঁদের ব্যাখ্যানুসারে, 'আধুনিক' হল সেই সব কিছু যা 'অনাধুনিক' নয়। 'অধুনা' এই কালবাচক বিশেষণটি এখানে গুণবাচক বিশেষণের পর্যায়ে পর্যবসিত। এছাড়া ধর্মতন্ত্রের উন্মেষ, যান্ত্রিক প্রগতি, তীব্র গতিময়তা ও 'পবিত্রতা'র অপমৃত্যু, নাগরিক জটিলতার ক্রমবর্ধমান চাপ, বোদলেয়ারীয় ভাবনায় নতুনতর সৌন্দর্যচেতনার সন্ধান— এ সবই আধুনিকতার অন্তর্ভুক্ত। এই আধুনিকতা সন্দেহাতীতভাবেই পাশ্চাত্য আধুনিকতা— পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রের উন্মেষ, বুর্জোয়া মূল্যবোধের উদ্ভব, যান্ত্রিক উদ্ভাবনের জোয়ার এবং পরিশেষে জটিল নাগরিক জীবনের জন্মকে বিবৃত করে বাংলা কবিতার আধুনিকতার পরিসরকে পরিমাপ করা অসম্ভব; কেননা, ধনতন্ত্রের বিকাশ এ দেশে ঘটেনি, শিল্পবিপ্লব বলে কিছু এদেশে হয়নি, যান্ত্রিক উদ্ভাবনের জোয়ারে জীবনযাত্রার অভূতপূর্ব মানোন্নয়ন তাই এ দেশে সম্ভব ছিল না— বস্তুত এদেশের জীবনচর্যার ধরন পাশ্চাত্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সম্ভবত এই কারণেই, রাডিয়ার্ড কিপলিং-এর ভাষায় বলতে হয় "The twine shall never meet।" ইংরেজদের ভারতবর্ষ অধিকার করা শুধু অর্থনৈতিক আগ্রাসনের চেহারাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি— সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ভারতবর্ষ তথা বাংলার চিন্তা ও চেতনার জগৎকে আগ্রাসন করার বিষয়টিও এখানে নিহিত ছিল। ফলে শাসক ইংরেজদের মতো করে শাসিত ভারতবাসী তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর পাশাপাশি ভাব ও চেতনাগত কাঠামোটিকেও নির্মাণ করে নিতে বাধ্য হয়— তা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও তাদের সামনে খোলা ছিল না। বস্তুতপক্ষে, ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষ একটি উপনিবেশ;

Scanned with CamScanner

আর আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম এই উপনিবেশের গর্ভেই। এই উপনিবেশের সূচনাবিন্দুই হল আমাদের 'আধুনিক' কালের সূত্রপাত; আর সেই সময়কালেরই বিশেষ ফসল হল আধুনিক বাংলা কবিতা।

বুদ্ধদেব বসু-র মতো সাহিত্যবেত্তার হাতে আধুনিকতার এই চরিত্র নির্ণয় অনেকক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে অতি নির্ণয়ের নামান্তর— নিজের ও নিজেদের কাব্যাদর্শকে আধুনিক হিসেবে চিহ্নিত করে অন্য কাব্যবৃত্তকে প্রশ্ন করার বিষয়টিও তিনি আরম্ভ করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'সংস্কৃত কাব্য ও আধুনিক যুগ' শীর্ষক প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'আধুনিকতা'-র মানদণ্ডে সংস্কৃত কাব্যকে বিচার করেছেন। সংস্কৃত কাব্যের 'আধুনিক' যুগে উপযোগিতা, রসভুক্তির যোগ্যতা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব— তাঁর পক্ষপাত "নীরস তরুবরপুরত ভাতি"-র পরিবর্তে "শুষ্ক কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে"র প্রতি। তাঁর যুক্তিতে, প্রথম ক্ষেত্রে "তথ্যের সঙ্গে ভাষার এখানে শোচনীয় বিসংগতি ঘটেছে"। লক্ষণীয়, সচেতনভাবেই তাঁর এই যুক্তিবিন্যাস কাব্যকৃতি সম্পর্কে পূর্ব প্রকল্পগুলিকে নস্যাৎ করছে। 'শুষ্ককাষ্ঠং'-এ তিনি খুঁজে পেয়েছেন "আমাদের জীবিত ভাষার অংশ"কে। পূর্বতন "আধুনিক রুচি" তাঁর কাছে নিন্দনীয় হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। সামগ্রিক অর্থে, বুদ্ধদেব এখানে অতীতকে অতি নির্ণয় করে চলেছেন তাঁর 'আধুনিক' চৈতন্য দিয়ে। এখান থেকেই 'আধুনিকতা' বিষয়ে কিছু প্রশ্ন উঠতে পারে। কেন এ' অতি নির্ণয়? যে রুচি 'নিন্দনীয়' তা 'অনাধুনিক'— তাহলে প্রশংসনীয় 'আধুনিক' রুচিটি কী? 'জীবিত ভাষা'-র চরিত্রই বা কী? এবং সর্বোপরি 'আধুনিক'— এই অভিধাটির পেছনে খলা করছে কোন ইতিহাস?

পরস্পর সংযুক্ত এই প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধান করতে গেলে আমাদের বাংলার ভূমিতে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের সময়টিতে ফিরে যেতে হবে। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিস্তৃত অঞ্চলে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলেনি— এডওয়ার্ড সাইদের *Orientalism* এবং *Culture and Imperialism* এর মতো গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থে তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর *Provincializing Europe* বইতে উপনিবেশের শাসনের এক ভিন্নতর মাত্রাকে উপস্থাপিত করেছেন, যেখানে জ্ঞানতাত্ত্বিক শাসনই হয়ে দাঁড়ায় শাসকগোষ্ঠীর প্রধানতম অভিপ্রায়। আধুনিক সমাজবিদ্যার গবেষণায় প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, পশ্চিম ইউরোপ তার উপনিবেশগুলিতে—

> শাসন বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তোলে এমন এক মনন, যেখানে এক বিশেষ উপরিকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে ঔপনিবেশিত চিন্তনকে, যা বস্তুতপক্ষে ঔপনিবেশিক মননের এক ঈষৎ বিকৃত প্রতিবিম্ব, যাকে সাম্প্রতিক মনোবিদ্যার ভাষায় 'মিমিক্রি' বললে ভুল হবে না।

মাইকেলের ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল অন্যরকম— তিনি তাঁর 'modernity' দিয়ে অতিনির্ণয় করেছেন দেশজ ঐতিহ্যকে। ততটুকু ঐতিহ্যই তাঁর রচনায় স্থান পায়, যতটুকু জ্ঞানদীপ্তিপ্রসূত আধুনিকতা এই কলোনির ভূমিতে তাকে প্রয়োগযোগ্য মনে করেছিল। এরপর বারবার বাংলা কাব্যে পশ্চিমি 'আধুনিকতা'-র দ্বারা ঐতিহ্যকে টেনে এনে কাঠামো গঠনের প্রবণতা লক্ষ করা

যায়— আজও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদী তাত্ত্বিক অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে সংযোজন করেছিলেন,

> "...ভবিষ্যতেও ঘটার সম্ভাবনা নেই। কারণ, বাংলা কবিতার, বিশেষ করে রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা 'আধুনিক' কবিতার ভূমিটি চরিত্রগতভাবে এই অতিনির্ণয় দ্বারা নির্মিত এক ক্ষেত্রজভূমি।"

এ ঘটনা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য, অষ্টাদশ শতক থেকে ইউরোপে Enlightenment (যার নবতম বাংলা পরিভাষা— 'বুদ্ধিবিভাসা') এক নবতম Discourse বা বাচন দ্বারা তৎকালীন কালকে আধুনিক কাল হিসেবে চিহ্নিত করে, তার বিপরীত প্রতিসাম্যে অতীতকে 'প্রাচীন' ও 'মধ্যযুগ'-এ বিভাজিত করে এবং তারপর নিজস্ব সময়ের জয়গান গাইবার জন্য যুক্তিবাদের মোড়কে পরিবেশন করে ক্ষমতার নতুনতর অভিজ্ঞানকে। মনোবিদ আশিস নন্দী তাঁর *The Intimate Enemy : Loss & Recovery of the Self Under Colonialism* (১৯৮৩) গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন, পশ্চিম ও ইউরোপের জ্ঞানদীপ্তির বাচনের ছাঁচে কীভাবে এই উপনিবেশ তৈরি হয়, তৈরি করে নেওয়া হয় ঔপনিবেশিক বাচন। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতেই, ইউরোপ যে-যে বিষয়গুলিকে 'অনাধুনিক' বা 'প্রাগাধুনিক' হিসেবে চিহ্নিত করে— সেই বিষয়গুলিই হুবহু অনুসৃত হয় ভারতবর্ষ তথা বাংলায়। ইউরোপীয় ভূমির আধুনিকতার প্রবক্তাদের মতোই কলোনিয়াল প্রভুরা তাঁদের বিবেচনাসম্ভূত 'আধুনিক' ধারণার বাইরের যাবতীয় সবকিছুকেই otherwise বলে নস্যাৎ করেন এবং তাঁদের পরিকল্পিত আধুনিকতাকেই প্রধানতম বাচন হিসেবে চিহ্নিত করেন— দেশীয় জনগণের একটি অংশও নানা 'সংস্কার আন্দোলন'-এর ধুয়ো তুলে উপনিবেশের প্রভুদের এই প্রকল্পকে বৈধতাও দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবে সাহিত্যও এই overdetermination-এর সীমার মধ্যে চলে আসতে বাধ্য হয়— ভারতচন্দ্র ভিক্টোরীয় নীতিবোধের নিক্তিতে নিন্দার্হ ও পরিত্যাজ্য হন; নিধুবাবু উনিশ শতকেই লিখে ফেলেন 'সুশীল' ভদ্রজনোনিত গান; কবিগানের কবিদের করে তোলা হয় 'Kabiwala' (তুলনীয় : 'ফেরিওয়ালা'), জেগে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ। তবে তাঁরও নিস্তার ছিল না; তাঁর জীবৎকালেই পরবর্তী প্রজন্মের 'আধুনিক' কবিরা তাঁকে 'রোম্যান্টিক' হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁকে 'অনাধুনিক'দের দলে ঠেলে দেয়; রবীন্দ্রনাথের নিজেরই খেদোক্তি : "আমাকে যে বলে ওরা জন্ম রোম্যান্টিক!" (নবজাতক/*সানাই*) হয়তো বুদ্ধদেব বসু এবং তাঁর মতো আরও অনেকে তাঁর মধ্যে 'জীবিত ভাষা'-র অভাব লক্ষ করেছিলেন। সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব এই পরিহৃত জগতের অন্যতম উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন মঙ্গলবোধকে— কবিতা থেকে আরও বর্জিত হলেন ঈশ্বর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রসাহিত্যে 'অসুন্দর মঙ্গল' বা 'অমঙ্গল সুন্দর' এই দুই ধারণাই অনুপস্থিত; বহুক্ষেত্রে এই দুটি বিষয়েই 'বিশেষ জোর' দিলেন তথাকথিত আধুনিকরা। শার্ল বোদলেয়ারের কবিতা অনুবাদ প্রসঙ্গে ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবিতার চরিত্র নির্ণয় প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেছিলেন, যা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

ক. ...বোদলেয়ারে এমন কেউ নেই— খুনে, মাতাল, লম্পট কিংবা অভাজন, কেউ নেই যে তার চৈতন্যের দ্বারা আক্রান্ত ও পীড়িত নয়, ভাবনা যার অস্ত্রে তন্ত্রে দংশন করেনি, কিংবা যার বিবেকের ভার প্রতিভূ কবি বহন করছেন না। মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী;

Scanned with CamScanner

মানুষ পাপী, কিন্তু সে জানুক সে পাপী; মানুষ রুগ্ন, কিন্তু সে জানুক সে রুগ্ন, মানুষ মুহূর্ষু, এবং সে জানুক সে মুমূর্ষু; মানুষ অমৃতাকাঙ্ক্ষী, এবং সে জানুক সে অমৃতাকাঙ্ক্ষী। বোদলেয়ারের সমগ্র কাব্যে, যেমন ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে, এই বাণী নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে। সকলে জানবে না, জানতে পারবে না বা চাইবে না; কিন্তু কবিরা জানুন। এই জ্ঞানই আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান।

এই বক্তব্যটি বিশেষ কিছু অর্থ বহন করে। যেমন খুনে, মাতাল, লম্পট, অভাজন, (ফুটনোটে বুদ্ধদেব বসু নারীদের 'মনোহীনা' বলেছেন!) — এরা প্রত্যেকেই শুভ চৈতন্যের আওতায় আসতে পারে 'আধুনিক' কবির কলমের খোঁচায়। দেকার্তীয় Cogito-র কী পরম বিজয়! যাইহোক, সমাজের এইসব প্রান্তবাসীরাও আত্মোপলব্ধির দরজায় নিজেদের সগৌরবে উপস্থিতির প্রমাণ দিতে পারে। কিন্তু এই আত্মোপলব্ধির চরিত্রটি কেমন? এর উত্তরে বলা যায় যে এই আত্মোপলব্ধি নেহাতই খ্রিস্টানি 'রেভোল্যুশন', যা উপনিবেশবাদের একান্ত ফসল। মানুষ নিজেকে 'পাপী' বলে, 'রুগ্ণ' বলে, 'মুমূর্ষু' বলে জানবে, এবং উপলব্ধি করবে সে 'অমৃতাকাঙ্ক্ষী'। অর্থাৎ তার 'উত্তরণ' ঘটবে। এই পথ কিন্তু সকলের জন্যে নয়, সবাই তা "জানবে না, জানতে পারবে না বা চাইবে না"। এই পথ কবিদের। কবিরা নেহাতই 'মেসায়া'। তাঁরাই তাঁদের 'আধুনিক' সাহিত্যের 'জ্ঞান' দ্বারা তারণ করবেন এই সব 'অভাজন'দের।"

খ. যাইহোক, উপনিবেশ যে-মনন কবিদের প্রদান করেছিল, তা পশ্চিম ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্ত চিন্তনের এক খণ্ড অংশ। এই খণ্ডাংশের মধ্যে অন্যতম ছিল 'প্রগতি'-র ধারণা। গত শতকের তৃতীয় দশকের শেষ পাদে প্রগতিবাদী সাহিত্য আন্দোলন সাহিত্যের যে নয়া ডিক্‌শন নির্মাণ করে তাতে মার্কসীয় প্রগতির ধারণা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছিল। সাহিত্যের নতুন ব্যাকরণকে যে-কোনোভাবে 'নির্মিত' করার চেষ্টা হয়েছিল, 'উজ্জীবনের' তাগিদে 'ক্ষয়িষ্ণু' বলে গালপাড়া হয়েছিল; বস্তুতপক্ষে, সমগ্র চার-এর দশক ব্যেপে বঙ্গীয় কবিকুল এই 'প্রগতি' নামক বিষয়টিতে মাথা গলিয়েছিলেন। নান্দনিক দিক থেকে বহু উচ্চমানের কবিতাই চল্লিশে লেখা হয়েছিল। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই 'প্রগতি' আন্দোলন-নির্দেশিত ফর্মুলা অনুসৃত হয়। চল্লিশ এ কারণেই স্বাধীনতাকে দেখেছিল ইউফোরিয়ার দৃষ্টিতে। আসন্ন স্বাধীনতার প্রতি স্বাগত জানাতে গিয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন— কেউই কলম ধরেননি দেশভাগের বিষয়ে। এমনকী জীবনানন্দও সে অর্থে না।

গ. ঔপনিবেশিক 'প্রগতি'র ধারণা এবং মার্কসীয় 'প্রগতি'র ধারণা মিলেজুলে যে ঘোর ইউফোরিয়া তৈরি করেছিল, তা দেশভাগের সময় এদেশের কবি ইন্টেলেক্‌চুয়ালদের উপর অ্যানাসথেসিয়ার কাজ করেছিল, নিদারুণ অস্ত্রোপচার তাঁরা টের পাননি। যাঁরা টের পেয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম— পাঁচের দশকের কবিকুল।

আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস— তা যেভাবেই তাকে দেখা হোক না কেন; কবিতা পত্রিকা ও পত্রিকাগোষ্ঠীর কবিদের আলোচনা ছাড়া সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। তাঁদের বৈচিত্র্যের বহুমাত্রা বহুক্ষেত্রেই আধুনিক কবিতার গতিপথকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। দীর্ঘ তিন দশক জুড়ে 'কবিতা' পত্রিকা এবং ২০২, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ-এর 'কবিতাভবন'-কে কেন্দ্র করে আধুনিক

বাংলা কবিতার যে বিচিত্র ও বহুবর্ণিল ইতিহাস তৈরি হয়েছে, তাকে জোর করে অপ্রাধান্য হয়তো দেওয়া যায়— কিন্তু অস্বীকার করা মিথ্যারই নামান্তর হয়ে দাঁড়াবে। কোন-না কোনভাবে, কোন-না-কোন সময়ে যাঁরা 'কবিতাভবন'-এর সংস্পর্শে এসেছেন, বুদ্ধদেব বসু-র ঋণ তাঁরা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন। কবি অরুণকুমার সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ' নামের বিখ্যাত কবিতাটিতে সেই হারিয়ে যাওয়া সময়টিই নিবিড়ভাবে ছায়াপাত ঘটিয়েছে :

কিন্তু 'আনন্দ কোথায়', বুদ্ধদেব বসু বললেন,
'য়ুরোপের আজকের কবিতায় কিংবা উপন্যাসে'?
রবীন্দ্রনাথকে দ্যাখো, কী উজ্জ্বল প্রশান্ত বিশ্বাসে
জীবন শাশ্বত জেনে মানুষকে ভালোবেসেছেন।...

অনেক গভীর রাতে আড্ডা ভাঙে কবিতাভবনে।
ট্রাম-বাস বন্ধ। চাঁদ! হেঁটে ফিরি। আলোছায়া দোলে
সহসা শুনতে পাই : ভাবনা আমার পথ ভোলে।
সংশয় বিমুক্ত চিত্ত; তাঁর স্থান তর্কাতীত, মনে।

'কবিতা' পরবর্তী যে দুটি পত্রিকা বাংলা আধুনিক কবিতা ও কবিতাভাবনাকে লালন করেছে, তারা যথাক্রমে 'শতভিষা' ও 'কৃত্তিবাস'। 'কবিতা'-তে যদি প্রাধান্য পায় তিনের দশকের কবিদের কবিতা; তাহলে বলা যেতেই পারে 'শতভিষা'-র পক্ষপাত ছিল চার ও কিছুটা পাঁচের দশকের কবিদের ক্ষেত্রে। সুধীর রায়চৌধুরী একটি লেখায় বলছেন, "...সময়ের হাতে তিরিশের দশকের কবিদের ব্যবহৃত কৌশলগুলির দিন যে ফুরিয়ে গিয়েছে 'শতভিষা' তা উপলব্ধি করেছিল, তিরিশের দশকের কবিদের যৌনকাতরতা, মূল্যবোধে অনাস্থা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অতিরিক্ত সমাজভাবনা, তরুণ কাব্যময়তা ইত্যাদি আপাতলক্ষণগুলি আর ব্যবহৃত হওয়ার নয়, এ সত্য অভ্রান্ত জেনে কবিতার মুক্তির জন্য 'শতভিষা' অনুভব করেছিল নতুন পথ সন্ধানের। আধুনিক ক্লিশেগুলি পরিত্যাগ করে কবিতার শরীরে নতুন প্রাণস্পন্দন আনার প্রচেষ্টাই ছিল শতভিষার প্রথমাবধি দায়িত্ব।" অর্থাৎ, এক দশক আগে লেখা কবিতার কারুগুণও 'আধুনিক ক্লিশে'র পর্যায়ে পর্যবসিত হতে সময় লাগেনি— কালের যাত্রার গতি এমনই দুর্দম! বস্তুত, এই অস্বীকার ও পুনরাবিষ্কারের কালচক্রেই আবর্তিত হতে থাকে বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাস। সেই মাত্রাটিই যে সতত পরিবর্তন-অভিসারী, তার প্রমাণ নানাভাবে, নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, 'শতভিষা'-গোষ্ঠী ১৯৫৪ সালে সেনেট হলের ঐতিহাসিক কবি সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিল— বাংলা কবিতার ইতিহাসে এই কবিসম্মেলনটি যে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য; তা মনস্ক পাঠককে আলাদাভাবে বলে না দিলেও চলে। শীত বসন্ত ১৩৬০ বঙ্গাব্দের 'শতভিষা' পত্রিকায় দীপংকর দাশগুপ্ত লিখিত এই সম্মেলনের বিবরণীটি তার বিশ্লেষণাত্মক ঘাতসহতার জন্যে একটি দলিলের মর্যাদা দাবি করতে পারে, এই বিবেচনায় প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল :

কবি সম্মেলন

সম্প্রতি সেনেট হলে কবি সম্মেলন হয়ে গেল ২৮শে আর ২৯শে জানুয়ারি— প্রতিদিন প্রায় আড়াই ঘণ্টা ক'রে— আধুনিক কবিরা স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে

Scanned with CamScanner

শ্রোতাদের শুনিয়েছে। এই রকম একটা সম্মেলনের উপযোগিতা কবি ও কবিতা অনুরাগীরা বিশেষভাবে অনুভব করছিলেন। ইতিপূর্বে ছোটোখাটো দু-একটি কবি সম্মেলন অবশ্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, যদিও এতবড়ো কবি সম্মেলন এই প্রথম। কবিতা যে শ্রোতব্যও ইদানীং আমরা সেটা প্রায় ভুলতে বসেছি। অথচ এই সেদিনও কবিতা উচ্চকণ্ঠে পঠিত হত। 'আধুনিক' কবিতাও আবৃত্তির যোগ্য, এই সত্য প্রমাণ করাই ছিল এই কবি সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য; তবে ভালো আবৃত্তি করতে পারা যে একটা বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় আর সেটা যে পরিশীলনসাপেক্ষ, গৌণত সে-তত্ত্বও কবিদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে।

তাছাড়া বিভিন্ন কবির সঙ্গে কবিতা অনুরাগীদের চাক্ষুষ পরিচয় এই সম্মেলনের মধ্যবর্তিতায় হয়েছে আর কবিরাও ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন— এরও একটা শুভ দিক আছে।

এমন মত প্রকাশিত যে 'আধুনিক' কবিতা উচ্চকণ্ঠে পাঠ্য নয়— এর আবেদন সরাসরি মনের দরজা দিয়ে। এ-মত কোনো কোনো ক্ষেত্রে মান্য, তবে সর্বত্র নয়; কারণ ছন্দ আর মিল কানের দরজা দিয়েই মনকে স্পর্শ করে— বিষয়গত তর্কের— আশা করি এটাই প্রথম আর শেষ সম্মেলন নয়, অতএব ভবিষ্যৎ সম্মেলনগুলির মধ্য দিয়ে এ তর্ক মীমাংসিত হবে। কবি সম্মেলন-এর সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, নীচে তাঁদের নাম দেওয়া হল :

আহ্বায়ক

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
আবু সয়ীদ আইয়ুব
দিলীপকুমার গুপ্ত

সম্পাদক

আলোক সরকার
পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

কার্যকরী সমিতি

অরুণকুমার সরকার — দীপংকর দাশগুপ্ত
সুভাষ মুখোপাধ্যায় — রোহীন্দ্র চক্রবর্তী
নরেশ গুহ — বাণী রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় — নীরেন্দ্র চক্রবর্তী
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবি সম্মেলনের আয়োজন ক'রে আহ্বায়কবৃন্দ কবি আর কবিতা অনুরাগীদের ধন্যবাদার্হ হলেন। প্রসঙ্গত, বৎসরে একাধিকবার কবি সম্মেলনের আয়োজন করা সম্ভব কিনা, তাঁদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

দীপংকর দাশগুপ্ত
শতভিষার পক্ষ থেকে

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কবিতায় 'আধুনিকতা'-র চরিত্র নির্মাণের একটি প্রক্রিয়া চলছে এবং কোনো সিদ্ধান্তই যে উপান্ত্যবিন্দুর নির্দেশক নয়— এই স্পষ্ট ও নিশ্চিত 'আধুনিক' মনোভঙ্গি এই প্রতিবেদনের প্রতি অক্ষরে। 'শতভিষা' ও 'কৃত্তিবাস' প্রায় কাছাকাছি সময়ে

প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও দুটি পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতা বেশ স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছিলেন অন্যতম সম্পাদক, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *কৃত্তিবাস সংকলন* ১ (২৫ বৈশাখ, ১৩৯১)-এর ভূমিকায়। প্রথমদিকের 'কৃত্তিবাস'-এ 'নবীন লেখকদের প্রতি নিবেদন'-এর প্রথমেই লেখা থাকতো : "কৃত্তিবাস শুধু কবিতার পত্রিকা নয়, আধুনিক কবিতার পত্রিকা"। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কৃত্তিবাস পত্রিকার আর একটি বিষয়ও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়, সেটি হল অগ্রজ কবিদের প্রয়াণলেখ ও সেই প্রসঙ্গে তাঁদের মূল্যায়ন— তিরিশের তিন প্রধান কবি : জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে পঞ্চাশের কবিদের মনোভঙ্গির পরিচয় যেখানে পাওয়া যায়। তারও পরবর্তী প্রজন্মের কবিদলের হাতে নিজস্ব গতিপথ পেয়েছে আধুনিক বাংলা কবিতা; আধুনিকতার মহাবাচন আর রাষ্ট্রীয় বাচন মিলেমিশে বাংলা কবিতার যে আধুনিকতা নির্মিত ও অতিনির্ণীত হল এবং হয়েই চলল, নিশ্চিত ভাবেই 'চাঁদের ওপিঠে' আরও অনেককিছু রয়েছে— আধুনিক সময়মাত্রার বিরুদ্ধে উচ্চারণসঞ্জাত দ্রোহও যেখানে থেকে যেতে পারে; থেকে যেতে পারে শৈল্পিক অন্তর্ঘাতের কোনো নিজস্ব ব্যাকরণ; থাকতে পারে নিজের মুদ্রাদোষে ক্রমশ একা হতে থাকা এই কাব্যভাবনাগুলিকে 'আধুনিক' বা 'পুনরুত্থানবাদী' তক্‌মা লাগানোর স্বাভাবিক প্রয়াস— কিন্তু এই তথাকথিত 'অনাধুনিকতা'-ই এক অন্যতর মাত্রা পায়; যখন ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র লেখেন :

> আসরে ঝাঁপ পড়ে গেছে, ধীরে ধীরে পুথি পাতড়া গুটিয়ে ফেলছেন, লাল বনাত গায়ে চাঁইবুড়ো, উঠে যাবার সময় হল তাঁর, কোনও দিন আর ডাক আসবে কিনা, কে জানে। আর কে পালা বাঁধবে তাঁর মতো? মনটা কি একটু আনচান করে? জানি 'দুর্ভাবনাময় জটিল সাম্প্রতিকের' মুখোমুখি আমরা, লোকে ধমক দেবে। এইসব ক্ষেত্রে বিষণ্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া কাজের কথা নয়, সেইটা রোমান্টিকতা, অলস 'নস্টালজিয়া'। ইতিহাসের আধুনিকতার, অনিবার্যতার বিরোধিতা। যা অবস্থা আজকাল, এই অতীতবিলাস বিপদজনকও হতে পারে, ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রশ্রয় দেবে, হয়তো বা দুর্বল করে তুলবে ধর্মনিরপেক্ষতার লড়াইকে। কিন্তু এও তো মনে হয় সে *সমূহের রসভুক্তির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে যথাযথ সামাজিক ও নান্দনিক মর্যাদা না দেওয়াটা কৃতঘ্নতা।* (নজরটান আমার) আরও শুনেছি যে অপু আজও স্বপ্ন দেখে, এই দরিদ্র, নিষ্পেষিত ছেলে, নিষ্ক্রিয় সময়ে প্রতিদিন তার কানে ভেসে আসে তার বাবার, কথক হরিহরের আশীর্ব্বচনের রেশ : কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যং; পৃথিবী শস্যশালিনী/ লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ...
>
> [কথকতার নানা কথা— গৌতম ভদ্র/ *নিম্নবর্গের ইতিহাস*/ গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত]

গৌতম ভদ্রের পূর্বোক্ত রচনার সূত্র ধরেই বলা যায়, আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস ব্যক্তিক অনুভূতিতে বৃহত্তর সামাজিক মাত্রা সংযোজনের ইতিহাস। কালগত অনুক্রমকে নিতান্তই একটি কেজো প্যারামিটার ধরে দিলে তিনের দশক থেকেই এই বিশেষ সংরূপটির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে— এমনটা বলাই যায়। দশকওয়ারি হিসেব ধরলে এই বিপুল সময়কালের মধ্যে বৈচিত্র্য সংখ্যায় কবি ও কবিতার সংখ্যা প্রচুর— কিন্তু পাঠ্যসূচিগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে থেকে নির্বাচিত কিছু কবির কিছু সিলেক্টিভ কবিতার

Scanned with CamScanner

'নিবিড় পাঠ'-এর বিষয়টি বর্তমান বইতে গুরুত্বসহকারেই আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে আংশিকতার দায় থেকে যাবেই, এ একরকম নিশ্চিত— তবে নির্বাচিত কবি ও কবিতার সারণিটি খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, দুই বিষয়েই কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা ও তৎসংক্রান্ত আলোচনাকে স্থান দেওয়া হয়েছে; সীমাবদ্ধতার মধ্যে সামান্য হলেও এ এক স্বস্তির দিক।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উটপাখী' কবিতার আলোচনায় সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায় সমসাময়িকের ইতিহাসচেতনার সঙ্গে সুধীন্দ্রীয় ভাববিশ্বের সংযোগের ছবিটি দক্ষতার সঙ্গে স্পষ্ট করে তুলেছেন— 'শাশ্বতী'-র আলোচনায় ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ও মোটামুটিভাবে সমাজ ও কবিতার এই নিপুণ টানাপোড়েনের বিষয়টিকেই ভাষারূপ দিয়েছেন। আবার এই 'শাশ্বতী'-রই আলোচনায় সঞ্চিতা চক্রবর্তী সুধীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনা ও আধুনিকতার সংকটবিন্দুগুলির মধ্যে এক সমীকরণ নির্মাণের প্রয়াসী। অঙ্কনা বেতাল-এর 'প্রার্থনা' পাঠ বায়োগ্রাফিক্যাল ক্রিটিসিজম্-এর সূক্ষ্মতায় অনবদ্য। আবার সংযুক্তা গুহ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সংবর্ত' বিষয়ক আলোচনায় কবিতার পাশাপাশি কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কেও তাঁর বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন।

অমিয় চক্রবর্তীর 'পিঁপড়ে'-র এক অসামান্য বিশ্লেষণী পাঠ উপহার দিয়েছেন মহুয়া দে— পাশাপাশি আবার সুদেষ্ণা মণ্ডল 'চেতন স্যাকরা' কবিতার আলোচনায় অমিয় চক্রবর্তীর কবিচেতনার আলোকময় দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন'-এর আলোচনা দুটি— প্রথম আলোচক শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় অমিয় চক্রবর্তীর সামগ্রিক কবিকৃতির নিরিখে কবিতাটিকে পাঠ করতে চেয়েছেন; আর দ্বিতীয় আলোচক অর্ণব রায় 'প্রতিরোধের শান্ত ভাষ্য' হিসেবেই কবিতাটির নিপুণ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কাক ডাকে' কবিতার একটি রূপতাত্ত্বিক পাঠ উপস্থাপিত করেছেন মৌলিনাথ বিশ্বাস— তাঁর আলোচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্য সৃষ্টির সঙ্গে এই কবিতার সংযোগরেখাটিকেও আবিষ্কার করা যায়। একই পদ্ধতিতে আশিস চক্রবর্তীর 'দশানন' পাঠ কবিতাটির অনেকগুলি আপাত-অনালোচিত স্তরকে পাঠকের সামনে তুলে ধরে। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় 'আমি কবি যত কামারের' কবিতাটির আলোচনাপ্রসঙ্গে সমগ্র প্রেমেন্দ্র-মানসের অনুসন্ধানের প্রয়াসী। শুভেন্দু দাশমুন্সীর 'ফ্যান' কবিতার আলোচনাও সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে কবিতাটির বিশ্লেষণকে এক ভিন্নতর মাত্রায় উপস্থাপিত করেন। সাগর মুখোপাধ্যায়-এর 'কবি' ও 'ফ্যান' বিষয়ক আলোচনা দুটি ভিন্ন গোত্রের— সাহিত্যবিচারের নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং অর্থনৈতিক ইতিহাসের নিরিখে ও একই সংরূপের অন্য ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় সাগর-এর এই প্রেমেন্দ্র পাঠ সম্পূর্ণই আলাদা।

তন্ময় বীর তাঁর বুদ্ধদেব বসু-র 'প্রত্যহের ভার' কবিতার আলোচনায় বাংলা আধুনিক কাব্যের প্রাণপুরুষের আধুনিকতাসংক্রান্ত এক বিশেষ দর্শনকে নিপুণতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। সঞ্চিতা চক্রবর্তীর 'ব্যাং'-এর আলোচনা বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিগত নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু নিখুঁত পর্যবেক্ষণকে বিধৃত করেছে। একইভাবে, অমৃতেন্দু মণ্ডলের লেখা 'কোনো এক মৃতার প্রতি' কবিতার আলোচনা বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুচেতনার আলোকিত উদ্ভাসন। বুদ্ধদেব বসুর সৌন্দর্যবোধ ও তার সঙ্গে 'আধুনিকতা'র নানামাত্রার সম্পর্ক প্রাঞ্জলভাবে উঠে এসেছে রাজর্ষি দাশ ভৌমিকের লেখা 'চিল্কায় সকাল'-এর আলোচনায়। 'শীতরাত্রির প্রার্থনা' ও 'রাত তিনটের সনেট' কবিতাদুটির বিশ্লেষণাত্মক পাঠ উপস্থাপিত করেছেন সন্দীপ মুখোপাধ্যায়—

তাঁর আলোচনায় বুদ্ধদেবের সামগ্রিক কবিকৃতির মানচিত্রে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতাকে নির্দিষ্ট স্থানাঙ্কে স্থাপন করার প্রয়াস প্রকৃতই অনবদ্য।

বিষ্ণু দে-র 'ক্রেসিডা' বিষয়ক আলোচনায় ট্রয়লাস ও ক্রেসিডার প্রেমের নানা ভাষ্য কীভাবে কবির সৃষ্টিতে সাঙ্গীকৃত হয়েছে, তার বিশ্লেষণ উঠে এসেছে কুন্তল মুখোপাধ্যায়ের রচনায়। 'ঘোড়সওয়ার' বিষয়ক দীর্ঘ আলোচনায় বিষ্ণু দে-র সমগ্র কবিমানসের নিরিখে অন্য কবিতার তুলনা-প্রতিতুলনায় কবিতাটির বিশ্লেষণাত্মক পাঠ উপস্থাপিত করেছেন দেবাঞ্জন দাস। 'টপ্পা ঠুংরি' ও 'ভিলানেল' কবিতা দুটির নিবিড় পাঠ করেছেন যথাক্রমে দীপাঞ্জনা শর্মা ও তপোমন ঘোষ।

আধুনিক বাংলা কবিতার 'আনসাং হিরো' সঞ্জয় ভট্টাচার্যের দুটি কবিতার 'মনে থাকবে না' এবং 'রাত্রিকে' নিয়ে দুটি আলোচনা লিখেছেন যথাক্রমে সুমিত দেবনাথ ও শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়। যে কবি যুগের প্রভাবের মধ্যেও স্বভাবতই স্বতন্ত্র, তাঁর কবিতার আলোচনা করতে গেলে সামগ্রিক কবিকৃতির বিষয়টিতে নজর দেওয়াও সমান জরুরি; আলোচকরা সেই জরুরি কাজটিই করেছেন।

অরুণ মিত্রের 'অমরতার কথা' বিষয়ে আশিস চক্রবর্তীর প্রবন্ধও কবিস্বভাব ও সত্তার সঙ্গে কাব্যবিশ্বের মেলবন্ধন গড়ে তোলার প্রয়াসী— কবি ও কবিতা দুই-ই তুল্যমূল্য গুরুত্ব পেয়েছে এখানে।

সমর সেনের 'মহুয়ার দেশ' কবিতার আলোচনায় কুন্তল চট্টোপাধ্যায় এই স্বল্পপ্রসূ অথচ গুরুত্বপূর্ণ কবির কবিমানস ও কবিতাটিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। ইমন ভট্টাচার্য সমর সেনের দুটি কবিতার আলোচনা করেছেন : 'মহুয়ার দেশ' ও 'মেঘদূত'— প্রথম কবিতার নৈর্ব্যক্তিকতা ও দ্বিতীয় কবিতার শাশ্বত অনুষঙ্গ কীভাবে তাঁর হাতে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে, তা ইমনের লেখায় উঠে এসেছে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মুখোশ' কবিতার আলোচনাপ্রসঙ্গে রবিন পাল এই অ্যাক্টিভিস্ট কবির জীবন ও কবিতার সংলগ্নতার বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

রবিন পাল-এর আলোচনায় উঠে এসেছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'বাতাসী' কবিতার নিবিড় পাঠ। একটি সামান্য অনুষঙ্গকে অবলম্বন করে ব্যক্তিগত অনুভূতি কীভাবে কবিতার চেহারায় বাণীরূপ পায়, এই কবিতাই তার প্রমাণ। নীরেন্দ্রনাথেরই 'সহোদরা' ও 'হঠাৎ শূন্যের দিকে' কবিতাদুটির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন যথাক্রমে সুদক্ষিণা বসু ও অরিত্র সান্যাল— সমসাময়িকতা ও সেখান থেকে কবিতা হয়ে ওঠার বিষয়টি এই আলোচনাদুটিতে সুন্দরভাবে উঠে এসেছে।

শঙ্খ ঘোষের গুরুত্বপূর্ণ কবিতা 'ছুটি'র আলোচনা করেছেন আবীরা সেনগুপ্ত— শঙ্খ ঘোষের নিহিত কবিস্বভাব তাঁর রচনায় উঠে এসেছে। অরিত্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন শঙ্খ ঘোষের দুটি কবিতা নিয়ে— 'ছুটি' ও 'ফুলবাজার'— দুটি আলোচনাতেই শঙ্খ ঘোষের অন্যান্য সাহিত্যকৃতির নিরিখে কবিতাদুটির 'পাঠ' নির্মাণ করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়, যা সন্দেহাতীতভাবে কবিতাদুটির কিছু নিভৃত দিককে নিয়ে নতুনভাবে ভাবায়।

Scanned with CamScanner

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'এক অসুখে দু'জন অন্ধ' কবিতার আলোচনায় বিজয় সিংহ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যবিশ্বকেই অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছেন। যে স্বর ও স্ব-ভাব বাংলা কবিতায় সংযোজন করেছিলেন এই 'স্বেচ্ছাচারী' কবি— তার আভাস এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট ভাবে উঠে আসবে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকীতে' কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন দুজন আলোচক— রমাপ্রসাদ দে এবং শুক্লা বিশ্বাস। একটি কবিতা দুজন আলোচকের নিপুণ হাতে ব্যঞ্জনার কত বিভিন্নমুখী বৈচিত্র্যের সন্ধান দিতে পারে, তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই দুটি রচনায়। বস্তুতপক্ষে, অনেকক্ষেত্রেই মনে হয়েছে— একটি টেক্সটকে দুজন আলোচকের হাতে পৃথকভাবে ছেড়ে দিলে এমনকিছু স্তর আলোচনায় উঠে আসে, যা অনেকাংশেই অ-ভূতপূর্ব।

নবনীতা দেব সেনের 'পৃথিবী বাড়ুক রোজ' কবিতার আলোচনা দিয়ে এই সংকলনে আপাত-সমাপ্তি। কীভাবে ব্যক্তি থেকে সমকাল পেরিয়ে কবিতা বিশ্বগত ব্যঞ্জনা খুঁজে নেয়, নবনীতা দেব সেনের কবিতা অবলম্বনে সুদক্ষিণা বসুর আলোচনা সেই প্রক্রিয়ারই সন্ধান দিতে প্রয়াসী।

আশার কথা এই যে, বর্তমান সংকলনের দু-একটি কবিতার ক্ষেত্রে অন্তত এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার সুযোগ পাওয়া গেল। তিনের দশক থেকে আরম্ভ করে পাঁচের দশক পর্যন্ত কবিদের নির্বাচিত কবিতার আলোচনা বর্তমান সংকলনে রইল— তারপর আরও চার-চারটি দশক পেরিয়ে শূন্য দশকের বাংলা কবিতাও আজ অন্তিম পর্বে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দকে যদি শূন্য দশকের সূচনাবিন্দু ধরা হয়, তাহলে তারও পরে দশ বছর সময় অতিক্রান্ত হয়েছে; পরবর্তী সময়ের কবিরাও গুটিগুটি পায়ে এসে দাঁড়াচ্ছেন আধুনিক বাংলা কবিতার সুপরিসর অঙ্গনে। এই ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক সংরূপটিকে আর একবার ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা প্রয়োজন। কেননা, এই বিশেষ সংরূপের বিবর্তন ঘটেছে চিন্তা ও চেতনার ক্রমিক বিবর্তনের পথ ধরে। এই আলোচনাসমূহকে পূর্ণাঙ্গ আখ্যা দেওয়া আর হাতের মুঠোয় পারদকে বিধৃত রাখা সন্দেহাতীতভাবে সমমাত্রিক প্রচেষ্টা— কিছু-না-কিছু কোনো-না-কোনোভাবে ফসকে যাবেই। পৃথিবীকে পুরোপুরি দেখতে গেলে পৃথিবীর মাপে চোখকে তৈরি করে নিতে হয়— তার সাধ থাকলেও সাধ্য থাকেনা; তাই চোখের মাপেই অনেকসময় পৃথিবীকে অন্তত তার কিছু সম্ভাব্য অনুপুঙ্খতাসহ যথাসম্ভব দেখে নেওয়ার চেষ্টা করেন অনেকে; সেটা দোষেরও কিছু নয়। এই সংকলন চোখের মাপে পৃথিবী তৈরি করে নেওয়ার বহমান প্রক্রিয়ায় একটি বিনীত ও সসংকোচ অংশগ্রহণ— এমনটি ভাবতেই আমরা বেশি স্বস্তি বোধ করব।

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

ঋষি ঘোষ

Scanned with CamScanner